Vol. 34 | No. 2 | 1991

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-মানস

Volume	34
Issue	2
Year	1991
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	এম. শমসের আলী
Published online	February 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v34i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v34i2.1
Pages	1-13
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান–মানস

এম. শমসের আলী

রবীন্দ্রনাথ সবার কবি। সবাই তাই বলে। তাঁর লেখা পড়ে সবারই মনে হতে পারে–'এ কথাত আমিই বলতে চেয়েছিলাম, এত আমারই কথা।' তাই যদি হয় তবে একজন বিজ্ঞানী যার ধ্যান আর জ্ঞান প্রকৃতি ও পরিবেশকে নিয়ে তিনি কেন খুঁজে পাবেন না তার কথা, রবীন্দ্রনাথের কথার মাঝে। এ প্রত্যাশা ত অত্যন্ত সঙ্গত। সঙ্গত এ কারণে যে মূলতঃ কবি ও বিজ্ঞানী উভয়েরই আনন্দ প্রকৃতি–পাঠে। তবে এই পাঠের পদ্ধতি দু'জনের দু'রকমের। একজনের প্রকৃতি–পরিচয় হয় পাখীর গানে, মৌমাছির গুঞ্জনে, নদীর কলতানে, সবুজের সমারোহে। অন্যজন প্রকৃতির মাঝে খুঁজে পেতে চান বিচিত্র বিধান আর সৃষ্টির চাতুর্য। কবি প্রকৃতির বৈচিত্র্য আর সৌন্দর্যের সম্ভার দেখে মুগ্ধ হন–বিজ্ঞানী প্রকৃতির মধ্যে খুঁজে পান কার্যকারণ সম্বন্ধ। এই শেষোক্ত কাজটি গদ্যময় মনে হতে পারে কিন্তু এ গদ্যই শেষ কথা নয়। এ গদ্য পেরিয়ে বিজ্ঞানী শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করেন এক নতুন ছন্দ ও তাল, যখন তিনি দেখতে পান যে আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্কবিহীন ঘটনাগুলোর মধ্যে রয়েছে সুন্দর সমন্বয়, প্রকৃতির প্রতিসাম্যের মাঝে রয়েছে একটি পরিপূর্ণ পরিকল্পনা। আর তখন তিনি জীব ও জড়ের শাসনে প্রকৃতির যে নিঃশব্দ নিয়মাবলী কাজ করে– তার মধ্যে খুঁজে পান এক অপূর্ব ঐকতান–শুনতে পান একটি একতার সুর। এই সুরেই একসাথে বাঁধা পড়ে কবি আর বিজ্ঞানীর মন। এই সুরের মূর্ছনায় সৃষ্টি আর স্রষ্টার মহিমায়, উভয়ের মাথাই নত হয়ে আসে।

ঠিক একই কারণে যে বিজ্ঞানীই রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়বেন তিনি কোন–না–কোন সমতলে এসে রবীন্দ্রনাথের সাথে একাত্মতাবোধ করবেন– তাতে কোনই সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান–মানস তাকে মুগ্ধ করবেই। শুধু যে প্রকৃতির লীলা খেলা অনুধাবনের মাঝেই এই বিজ্ঞান–মানস প্রচ্ছন্নভাবে ধরা পড়ে তা নয়–কখনও কখনও এর প্রকাশ ঘটেছে একেবারে প্রত্যক্ষভাবে। প্রকৃতি–পাঠের সূত্র ধরেই যে বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়–তা

একদিন ধীরে ধীরে একটা বিরাট শক্তিতে পরিণত হল–বিজ্ঞান জন্ম দিল প্রযুক্তির। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি মিলে সমাজ আর সভ্যতার চেহারা দিল পাল্টে–মানুষের জীবন যাত্রার রীতি–নীতিও গেল বদলে। ওদিকে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে প্রকৃতির উপর শুরু হল এক নির্দয় বৈজ্ঞানিক দৌরাত্ম্য। প্রকৃতি জয় করার নামে শুরু হল তার গতিকে বদলে দেয়ার চেষ্টা। দু'এক ক্ষেত্রে প্রকৃতি যে প্রতিশোধ নিল না তা নয়। এগুলো কিন্তু একেবারেই হাল আমলের কথা। ভাবতে অবাক লাগে যে রবীন্দ্রনাথের লেখায় এ সবের আভাস অনেক আগে থেকেই পাওয়া যায়। নিজের মাটিতে না হলেও রবীন্দ্রনাথ অন্যের ভূমিতে বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটতে দেখেছেন। তিনি বিজ্ঞানের কথা লিখেছেন–বিজ্ঞানের শক্তি যা দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন তার কথাও লিখেছেন। তার লেখাতে বিজ্ঞানের সুদূরপ্রসারী প্রভাব মাঝে মাঝে বিমূর্ত হয়ে উঠেছে। কোন সমালোচক হয়ত এই মুহূর্তে বলে উঠবেন, 'রবীন্দ্রনাথের বিদ্যে ছিল, বুদ্ধি ছিল, তিনি সারা পৃথিবীটা ঘুরে বেড়িয়েছেন, দু'পাঁচজন সমসাময়িক বিজ্ঞানীর সাথে ওঠা–বসা করেছেন। তাই যদি তার কলমে বিজ্ঞানের কিছু ছিঁটে–ফোটা কথা বেরিয়েও থাকে তাতে আর বিচিত্র কি। তাতে কি আর বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান–মানস প্রবল ছিল? এ ধরনের সমালোচনা পাছে ওঠে, তাই আগেই বলে রাখা দরকার যে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান–চেতনা কোন হালকা জিনিষ নয়। বিজ্ঞান–চর্চার জন্য যে অনুসন্ধিৎসা দরকার, যে খোলা মন দরকার, যে মননের দরকার, তা সবই রবীন্দ্রনাথের ছিল। তাই তিনি নিজে বিজ্ঞান গবেষণা না করলেও বিজ্ঞানের বাণীগুলোকে গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। বিজ্ঞানী না হয়েও তিনি বিজ্ঞানের শক্তির কথা অন্যকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান–চেতনা ছিল খুবই জোরালো। তবে আগেই বলেছি এ চেতনা কখনও বলে কয়ে প্রকাশ পেয়েছে আবার কখনও তা ঠাঁই পেয়েছে কবি–সত্তার গভীরে। কবি নিজেও হয়ত তা টের পাননি। এবার সমালোচক আবার প্রশ্ন করতে পারেন– রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান–চেতনা যদি এতই গভীর ছিল, তবে এ সম্বন্ধে বড় একটা শোনা যায়নি কেন? আমরা রবীন্দ্রনাথের কবি–মানসের কথা বলি, আধ্যাত্মিক–মানসের কথা বলি কিন্তু তার বিজ্ঞান–মানসের কথা তেমন বলিনা কেন? এটি কিন্তু একটি যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন। তবে এ প্রশ্নেরও একটি জবাব আছে। আমাদের দেশে বিজ্ঞান এখনও শিকড় গাড়তে পারেনি। তাই সে মানুষের আপন জিনিষ হয়ে ওঠেনি, কৃষ্টির অংগ হয়ে উঠতে পারেনি। অন্যদিকে আবহমানকাল থেকে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা এই দেশে রাখালের বাঁশী আর বাউলের একতারাই মানুষের মনকে উদ্বুদ্ধ করেছে–এখনও যে করেনা তা নয়। তবে এখন বাঁশী আর

একতারার প্রাধান্য কিছুটা কমেছে। জীবন এখন ছুটেছে অন্য গতিতে– এখন জটিলতা এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এই জটিলতার মূলে প্রযুক্তির অভাব– কখন বা তার আধিক্য, তবু এখনও আমাদের কবিরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামান না– তাদের পাঠকরাও সেজন্য তাদের প্রতি কোন দোষারোপ করেন না। তবুও হতাশ হলে চলবে না। এ অঞ্চলের মানুষের ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে হলে বিজ্ঞানকে একদিন অবশ্যই হাতিয়ার হিসাবে তুলে নিতে হবে। ঠিক এই আশাবাদই একদিন ফুটে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বিজ্ঞানের অনেক কথাই মূর্ত হয়ে উঠেছে। অথচ কথাগুলো যে বিজ্ঞানের সে কথা কোথাও 'নোটিশ জারি' করে বলা হয়নি। আর সেখানেই রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান–মানস–এর অবিনবত্ব। অনেক দিন পরের কথা অনেক দিন আগে কত সহজভাবেই না ফুটে উঠছে তার লেখায়। হাল আমলের বৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলোর পদচারণা তিনি যেন আগেভাগেই শুনেছিলেন। সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রধান দুটি হচ্ছে জ্বালানী সমস্যা ও পরিবেশ বিদূষণ। প্রথমটির কথাই ধরা যাক। সারা বিশ্ব আজ জ্বালানী সমস্যায় ভুগছে। সমস্যাটা সংক্ষেপে হল এই যে, পৃথিবী নামক গ্রহটির মাটির তলায় কোটি কোটি বছর আগে উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ চাপা পড়ার পর যে কয়লা, তেল ও গ্যাসের সৃষ্টি হয়েছিল, তা এই গ্রহের অধিবাসীরা তুলছে ত তুলছেই। ওদিকে প্রতিদিন গ্রহপৃষ্ঠে দেখা দিচ্ছে নতুন নতুন মুখ জ্বালানীর নতুন চাহিদা নিয়ে। এভাবে পৃথিবীর জ্বালানী সম্পদ শেষ করে ফেললে আগামী দিনগুলোর অধিবাসীদের অবস্থাটা হবে কি? এ সব ভেবে–চিন্তে হালে বিজ্ঞানীরা শক্তির বিকল্প উৎসের কথা বলছেন। একটি প্রধান বিকল্প হল সৌরশক্তি যা অবারিত এবং যা যত খুশী খরচ করা যাক, প্রকৃতির কাছে কোন বিল পরিশোধ করতে হয়না। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো সৌরশক্তি ব্যবহার করছে প্রতিনিয়ত, তাদের নিত্তনৈমিত্তিক কাজে। তবে সৌরশক্তি ধরে রেখে পরে সুবিধামত সময় তাকে ব্যবহার করার জন্য দরকার হয় যে প্রযুক্তির তার পরিপূর্ণ বিকাশ এখনো ঠিক ঘটেনি। সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য নির্মিত হয়েছে সৌরকোষ (সোলার সেল)। তবে এই সৌরকোষের কার্যদক্ষতা খুব একটা বেশী নয়। সৌরকোষের উপর যতখানি সৌরশক্তি এসে পড়ে, জানা মতে তার শতকরা প্রায় ২০ ভাগ পর্যন্ত বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। ওদিকে জীববিজ্ঞানীরা বলছেন যে সৌরশক্তির ব্যবহারে উদ্ভিদের চাতুর্য মানুষের চাইতে অনেক বেশী। একথা সত্যি যে যেটুকু সৌরশক্তি উদ্ভিদের পাতায় এসে পড়ে, উদ্ভিদ তার সবটাই গ্রহণ করে না।

অধিকাংশই প্রতিফলিত হয়, বিচ্ছুরিত হয়–শতকরা সর্বোচ্চ প্রায় ৫ ভাগ সৌরশক্তি উদ্ভিদ কাজে লাগায় 'ফটোসিনথেসিস' বা আলোক–সংশ্লেষণের কাজে। এই প্রক্রিয়া উদ্ভিদ মাটি থেকে পানি নিয়ে বাতাস থেকে কার্বন–ডাইঅক্সাইড নিয়ে তার পাতার সবুজ অংশে ক্লোরাফিল নামক যে রাসায়নিক দ্রব্য আছে তা এবং সূর্যালোক ব্যবহার করে সে তৈরি করে খাবার, যার কিছুটা লাগে তার নিজের পরিবৃদ্ধিতে আর বাকীটা জমা থাকে তার দেহে, কাঠ আর তন্তু হিসাবে। তা–ই পরে আমরা ব্যবহার করি জ্বালানী হিসাবে। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে মানুষ ত সৌরশক্তি শতকরা প্রায় ২০ ভাগ পর্যন্ত বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে কিন্তু সব উদ্ভিদ সৌরশক্তির শতকরা ৫ ভাগও ব্যবহার করতে পারে না। তা হলে আর মানুষের চাইতে উদ্ভিদের সৌরকৌশল উন্নতমানের হল কেমন করে? এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে সৌরকোষে সৌরশক্তি থেকে যে বিদ্যুৎ শক্তি তৈরি করা হয় তা যদি সরাসরি ব্যবহার করা না হয় তবে তাকে আবার 'স্টোর' করতে অর্থাৎ ধরে রাখতে হবে স্টোরেজ ব্যাটারীর মাধ্যমে। এতে শক্তির কিছুটা অপচয় ঘটে। উদ্ভিদের বেলায় সবকিছু সরাসরি ঘটে। যেটুকু সৌরশক্তিই উদ্ভিদ গ্রহণ করুক না কেন, তা ব্যবহৃত হয় খাদ্য তৈরির কাজে আর নিজ প্রয়োজন ছাড়া উদ্ভিদ এর সবটাই ধরে রাখে তার দেহে– উদ্ভিদের তাই কোন 'স্টোরেজ'–সমস্যা নেই। অর্থাৎ এক কথায় উদ্ভিদ সৌরশক্তিকে বন্দী করে রাখে তার অঙ্গের মাঝে। আর কাঠ যখন জ্বালান হয় তখন এই বন্দী থাকা সৌরশক্তিই বেরিয়ে আসে দাউ দাউ করে। এই অর্থে বেশী করে গাছ লাগানোর মানে বেশী করে সৌরশক্তির ব্যবহার।

এ মুহূর্তে অনেকেই হয়ত ভাবছেন–রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান–মানসের কথা বলতে গিয়ে সৌরশক্তি আর উদ্ভিদের কথা কেন। ধান ভানতে শিবের গীত কেন? হ্যাঁ, এতক্ষণ উদ্ভিদের গীতই গাওয়া হল বটে। তবে রবীন্দ্রনাথ উদ্ভিদের যে গীত গেয়েছেন, তার সত্যি জুড়ি নেই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'ওই গাছগুলো বিশ্ব বাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে একতারা ছন্দের নাচন।' এ যে শুধু ভাবের কথা তাই নয়। এর মধ্যেই ধরা পড়েছে বৃক্ষের নীরব লীলাকে বুঝবার প্রয়াস। এ প্রয়াস আরও মূর্ত হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের 'বৃক্ষ বন্দনা' কবিতায়,[১] যেখানে তিনি বলেছেন'–

"অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ আদিপ্রাণ
উর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা

ছন্দহীন পাষাণের বক্ষ–পরে আনিলে বেদনা
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে।"

আলো সাত রংয়ের বর্ণালী। তার প্রতিটি রংয়ের তরঙ্গ–দৈর্ঘ্য আলাদা। বৃক্ষের উপর যখন সৌরশক্তি এসে পড়ে বৃক্ষ সালোক–সংশ্লেষণের জন্য সে আলোর সবগুলো তরঙ্গ ব্যবহার করেনা–কিছুটা বাদ–ছাদ দিয়ে করে। এসব দেখে মনে হয়, আলোর মধ্যে কি লুকিয়ে আছে বৃক্ষ তার খবর রাখে–এর কতটুকুই বা তাকে নিতে হবে, তাও সে জানে। বৃক্ষের এই আলোক–তরঙ্গ বাছাইয়ের খবর বিজ্ঞানী টের পেয়েছেন পরীক্ষা আর নিরীক্ষার মাধ্যমে। কিন্তু গাছকে উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন–

'......সুন্দরের প্রাণমূর্তিখানি
মৃত্তিকার মর্ত্তপটে দিলে তুমি প্রথম বাখানি
টানিয়া আপন প্রাণে রূপশক্তি সূর্যালোক হতে
আলোকের গুপ্তধন বর্ণে বর্ণে বর্ণিলে আলোতে।'

–তখন মনে হয় রবীন্দ্রনাথ গাছের এই গোপন কথা জেনেছিলেন বোধকরি এক গভীর আত্মোপলব্ধির ফলে। এ প্রসংগে তুলে ধরতে হয় আরো কয়েকটি লাইন–

"দ্যান বলে তোমার মাঝার
গেছি আমি, জেনেছি, সূর্য্যের বক্ষে জ্বলে বহ্নিরূপে
সৃষ্টি যজ্ঞে যেই হোম, তোমার সত্তায় চুপে চুপে
ধরে তাই শ্যামস্নিগ্ধরূপ, ওগো সূর্য্য রশ্মিপায়ী
শত শত শতাব্দীর দিনধেনু দুহিয়া সদাই
যে তেজে ভরিলে মজ্জা, মানবের তাই করি দান
করেছ জগৎজয়ী'

– এই লাইন কটিতে কবি গীতিময় ভাষায় প্রকাশ করেছেন গাছ কি করে সূর্যের শক্তিকে আটকে রেখেছে তার দেহের স্তরে স্তরে। আজ থেকে অর্ধ শতাব্দীরও আগে রবীন্দ্রনাথ সূর্যরশ্মিপায়ী গাছের মজ্জাতে যে তেজের কথা লিখেছিলেন, আজকের জ্বালানী সমস্যা কবলিত পৃথিবী নতুন করে সেই তেজের কথাই বলতে শুরু করেছে। এ প্রসংগে উল্লেখ করতে হয় যে কয়েক বছর আগে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জাতিসংঘের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক মহাসম্মেলন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্যে ছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে একটি ব্যাপক

কর্মসূচী প্রণয়ন করা। এই সম্মেলনে হাল আমলের উন্নয়ন–সংক্রান্ত যে সব জটিল সমস্যা আলোচনা করা হয়েছিল তার মধ্যে ছিল জ্বালানী সংকট। সম্মেলনের অন্যতম সুপারিশ ছিল এই যে বিকল্প উৎস হিসাবে সালোক–সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার যে প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা আছে, তা পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। এভাবে গাছের মারফৎ সৌরশক্তির রূপান্তর ঘটিয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর শক্তির চাহিদার একটা বড় অংশই মেটান যেতে পারে। এ মুহূর্তে এ দেশগুলো শক্তি–চাহিদার শতকরা ৭৫–৮০ ভাগই এসে থাকে সনাতন লাকড়ী থেকে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বীর্যকে ধৈর্যে বেধে সনাতন কাল থেকে গাছ দেখাচ্ছে শক্তির শান্তি রূপ'।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান–মানসের আরো একটি উল্লেখযোগ্য দিক জীবন ও পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা। আজ পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই পরিবেশ বিদুষণ ও 'হিউম্যান ইকোলজী' অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে বেশ উৎকন্ঠা ও উদ্বেগ প্রকাশ পাচ্ছে। পরিবেশের উপর ঘন ঘন আহুত হচ্ছে সম্মেলন–এসব সম্মেলনে তর্কের ঝড় উঠছে–আলোচিত হচ্ছে কলকারখানা, যানবাহনের নির্গত ধোঁয়া থেকে কিভাবে কিছুটা পরিত্রাণ পাওয়া যায়–আরো আলোচিত হচ্ছে আমাদের ঘরবাড়ী কেমন হওয়া উচিত–তার চারপাশের গাছপালা কেমন থাকা উচিত, গোচারণভূমি না থাকার ফলে গোকুলের কি অসুবিধা হচ্ছে–জ্বালানীর প্রয়োজনে দ্বিধাহীন ভাবে গাছ কেটে ফেলার ফলে আমরা মরুভূমির মত অবস্থা সৃষ্টি করছি কিনা ইত্যাদি। অথচ ভাবতে অবাক লাগে যে আজ থেকে আশি বছরেরও আগে প্রশ্নগুলো রবীন্দ্রনাথের মনকে নাড়া দিয়েছিল গভীরভাবে। তিনি পরিবেশ বিজ্ঞানের সমস্যাটাকে অনেক আগে থেকেই সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। এক্ষেত্রে পরিবেশ বিজ্ঞানের পরিভাষা ব্যবহার না করলেও, তিনি যে বিষয়টির গভীরে ঢুকতে পেরেছিলেন তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার কবিতায়। 'সভ্যতার প্রতি' কবিতায় পরিবেশ প্রসঙ্গে তাঁর আবেদন ছিল[২]

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর
লও হাতে লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব্য সভ্যতা। হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুনচ্ছায়ারাশি
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান"

এ যুগের বিজ্ঞানীদের তাই এটা বুঝতে কোনই অসুবিধা হবার কথা নয় যে হিউম্যান ইকোলজীর কথা সর্বপ্রথম যারা চিন্তা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাদের মধ্যে অন্যতম।

বিজ্ঞানের ছাত্র না হলেও রবীন্দ্রনাথ তার সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর দার্শনিক তাৎপর্য বুঝতে মোটেই পিছপা হননি। এমনি ধরনের একটি আবিষ্কার ছিল আপেক্ষিকতা তত্ত্ব। এই আপেক্ষিকতা তত্ত্বের দুটো পর্যায় আছে–একটা বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব, অন্যটি সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব। গাণিতিক জটিলতা বাদ দিলেও বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মর্মকথাগুলো বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। এই মর্মকথাগুলোর প্রথমটি হচ্ছে এই যে, আলোর উৎস স্থির হয়েই থাকুক বা চলমান থাকুক আলোর গতিবেগ হবে ধ্রুবক। দ্বিতীয় মর্মকথা হচ্ছে এই যে পদার্থবিদ্যার আইন–কানুনগুলো 'ইনার্শিআল রেফারেন্স ফ্রেম' বা জড় কাঠামোর উপর নির্ভর করতে পারেনা অর্থাৎ একটা স্থির ট্রেনের কামরার মধ্যে পদার্থ বিজ্ঞানের এক্সপেরিমেন্ট করে যে ফল পাওয়া যাবে–ট্রেনটি সুষম গতিবেগে চলতে থাকলেও ওই কামরার মধ্যে এক্সপেরিমেন্ট করে একই ফল পাওয়া যাবে। এখানে স্থির কামরা এবং চলমান কামরা এদের প্রতিটিই হচ্ছে এক একটি জড় কাঠামো। বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের কয়েকটি চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত আছে। এগুলো হচ্ছে এই যে স্থির হয়ে থাকলে কোন পদার্থের যে ভর থাকে–সে পদার্থ নড়তে থাকলে তার ভর যায় বদলে। অন্যদিকে ঘড়ি স্থির হয়ে থাকলে যে সময় দেবে, ঘড়িটি ছুটতে থাকলে তার চাইতে কম সময় দেবে। এগুলো পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে, তবুও বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা এগুলো টের পাইনা কেন? টের পাইনা এ কারণে যে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের 'এফেক্ট' বা প্রভাব ধরা পড়ে যখন পদার্থের গতিবেগ আলোর গতিবেগের (অর্থাৎ সেকেন্ডে ১৮৬,০০০ মাইলের) তুলনায় নিতান্তই কম নয়। কিন্তু যে সব গতিবেগে আমরা চলাফেরা করি সেগুলো আলোর গতিবেগের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। আর তাই আপেক্ষিকতা তত্ত্বের প্রভাব আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের এই সব বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত শুধু যে বুঝতে চেষ্টা করেন তাই নয়। তিনি তার নায়ক–নায়িকার মুখে প্রাসঙ্গিকভাবে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের কথাগুলো তুলে দেন। এ প্রসংগে উল্লেখ করতে হয় যে 'শেষের কবিতা'[৩] উপন্যাসে লাবণ্য বলছে 'সহজ নয় সময় লাগবে' আর অমিত বলছে 'সময়টা সকলের সমান লাগা উচিত নয়। একঘড়ি বলে কোন পদার্থ নেই। ট্যাকঘড়ি আছে, ট্যাক অনুসারে তার চাল। আইনস্টাইনেরও তাই মত।' অমিত চরিত্রের স্রষ্টা

রবীন্দ্রনাথ আইনস্টাইনের সংগে মিলিত হয়েছেন–তিনি যে শুধু আপেক্ষিকতা তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক দিকটা বুঝবার চেষ্টা করেছেন তা নয়–এ তত্ত্বের দার্শনিক তাৎপর্য অর্থাৎ ভর–তেজের সমতুল্যতা, স্থান ও কালের একীভূতকরণ–ইত্যাদি তাঁকে মুগ্ধ করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে যুদ্ধক্লান্ত ইউরোপ যেমন গভীর আগ্রহ নিয়ে আইনস্টাইনের নতুন বিশ্বদর্শনের দিকে আকৃষ্ট হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠিক তেমনিভাবেই সমসাময়িক এই মহান বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে নিজে উপলব্ধি করেছেন–এবং যতদূর সম্ভব এর প্রতিফলন ঘটেছিল তার লেখার মাঝে। আপেক্ষিকতা তত্ত্বের প্রসংগটা একটু বিশদভাবেই টানা হল এটা বোঝাবার জন্যেই যে প্রচলিত ধ্যান–ধারণার মূলে আঘাত করে যে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়েছিল আইনস্টাইনের তত্ত্বে, তার থেকে রবীন্দ্রনাথ দূরে থাকেন নি– বরং তার গূঢ় নির্যাসটুকু বুঝবার প্রয়াস পেয়েছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বৈজ্ঞানিক জগতে ঘটে গেছে বেশ কিছু আলোড়ন সৃষ্টিকারী আবিষ্কার যার প্রয়োগ ঘটেছে মহাশূন্য অভিযানে, কম্পিউটার ও আরো কিছু ক্ষেত্রে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আধুনিক কবি, সাহিত্যিকরা এই সব আবিষ্কার থেকে বেশ একটু নিরাপদ দূরত্বই বজায় রেখেছেন। এর একটা সম্ভাব্য কারণ হিসাবে হয়ত বলা যেতে পারে যে অশিক্ষা, দারিদ্র্য আর ব্যধির কবলে জর্জরিত যে দেশের মানুষ, সে দেশের সাহিত্যকর্মে হাল আমলের সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের তাৎপর্য প্রতিফলিত হবে–এটা আশা করা ঠিক নয়। এই যুক্তির জোর যেনেই তা নয়। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই আবিষ্কারগুলোই যে দারিদ্র্য মোচনের পথ প্রশস্ত করেছে–সে কথা বুঝতে হবে এবং বলতে হবে সাহিত্যের নিজস্ব আঙ্গিকে। বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ড পরিপূর্ণ জীবন–পদ্ধতির একটি অংশ–সমসাময়িক সাহিত্যে এ পদ্ধতির প্রতিফলন হওয়া উচিত সামগ্রিক ভাবে, আংশিক ভাবে নয়।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি আর মানবগোষ্ঠীর নবতর বিকাশ এর প্রতি ছিল রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ তার জীবদ্দশায় পারমাণবিক বিস্ফোরণের কথা শুনে যাননি, ট্রানজিস্টর, মাইক্রো–ইলেকট্রনিকস্ কম্পিউটার ইত্যাদির প্রবর্তন দেখে যাননি। শিল্প–বিপ্লবের সময় বিজ্ঞানের যে সূত্রগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল, সেগুলোই ধীরে ধীরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মাটিতে কিভাবে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হল প্রগতি আর সমৃদ্ধির লক্ষ্যে তা রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করে গিয়েছেন। তিনি দেশে দেশে ঘুরেছেন। এ সময় তিনি যেমন দেশ–কাল–ধর্মকে পেরিয়ে মানুষের মধ্যে এক সদা–জাগ্রত সত্তার সন্ধান পেয়েছেন, তেমনি এই সব মানুষের হাত ও পাগুলোকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

কিভাবে চালাচ্ছে বা চালাতে পারে তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি একবার জাপান যাচ্ছিলেন। সে অনেক দিন আগের কথা। চীন তখনও গড়ে ওঠেনি। যাওয়ার পথে হংকং বন্দরে চীনা মজুরদের শক্তি, কাজের নৈপুণ্য এবং কাজের আনন্দকে পুঞ্জিভূতভাবে একত্র দেখতে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হন। তখনই তিনি লিখেছিলেন[৪] 'এই এত কালের একটা শক্তি যখন আপনার আধুনিক কালের বাহনকে পাবে, অর্থাৎ যখন বিজ্ঞান তার আয়ত্ত হবে, তখন পৃথিবীতে তাকে বাধা দিতে পারে এমন কোন শক্তি আছে? এখন যে সব জাতি পৃথিবীর সম্পদ ভোগ করছে তারা চীনের সেই অভ্যুত্থানকে ভয় করে, সেই দিনকে তারা ঠেকিয়ে রাখতে চায়। এখানে রবীন্দ্রনাথ যেন ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। চীনের অভ্যুদয় একদিন ঠিকই ঘটল। চীনকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারলনা। এ প্রসংগে যে জিনিষটি লক্ষণীয় তা হল এই যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি একটি গভীর আস্থাবোধ থেকেই রবীন্দ্রনাথ এমনি আশা ব্যক্ত করতে পেরেছিলেন।

জাপানে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। আজ আমরা জাপানকে বলে থাকি 'ওয়ার্কশপ অফ দি ইস্ট' বা প্রাচ্যের কর্মশালা। পঞ্চাশ বছরেরও আগে যখন রবীন্দ্রনাথের পা পড়ে জাপানের মাটিতে, তখন এই কর্মশালা আজকের মত এতটা অত্যাধুনিক হয়নি—তবুও তখনই টের পাওয়া গিয়েছিল, এর কর্ম—পাগল প্রাণ—চাঞ্চল্য। কবির নিজের ভাষাতেই বলতে হয়[৫] 'এশিয়ার মধ্যে জাপানই এই কথাটি একদিন হঠাৎ অনুভব করল যে, ইউরোপ যে শক্তিতে পৃথিবীতে সর্বজয়ী হয়ে উঠেছে একমাত্র সেই শক্তির ধারাতেই তাকে ঠেকানো যায় নইলে তার চাকার নীচে পড়তেই হবে এবং একবার পড়লে কোনকালে আর ওঠবার উপায় থাকবে না।'

এই কথাটি যেমনি তার মাথায় ঢুকল অমনি সে আর এক মুহূর্ত দেরী করলনা। ইউরোপের কামান—বন্দুক, কুচ—কাওয়াজ, কলকারখানা, অফিস—আদালত, আইন—কানুন যেন কোন আলাদিনের প্রদীপের যাদুতে পশ্চিমলোক থেকে পূর্বলোকে একেবারে আস্ত উপড়ে এনে বসিয়ে দিল। নতুন শিক্ষাকে ক্রমে ক্রমে সইয়ে নেওয়া, বাড়িয়ে তোলা নয়, তাকে ছেলের মত শৈশব থেকে যৌবনে মানুষ করে তোলা নয়—তাকে জামাইয়ের মত একেবারে পূর্ণ যৌবনে ঘরের মধ্যে বরণ করে নেওয়া। বৃদ্ধ বনস্পতিকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় রোপণ করবার বিদ্যা জাপানের মালীরা জানে, ইউরোপের শিক্ষাকেও তারা তেমনি করেই তার সমস্ত জটিল শিকড় এবং বিপুল ডাল-পালা সমেত নিজের দেশের মাটিতে এক রাত্রির মধ্যেই খাড়া করে দিল। শুধু যে তার পাতা ঝড়ে পড়ল তা নয়, পরদিন থেকেই তার ফল ধরতে থাকল।

প্রথম কিছুদিন ওরা ইউরোপ থেকে শিক্ষকের দল ভাড়া করে এনেছিল। অতি অল্প কালের মধ্যেই তাদের প্রায় সমস্ত সরিয়ে দিয়ে, হালে এবং দাঁড়ে নিজেরাই বসে গেছে-কেবল পালটা এমন আড় করে ধরেছে যাতে পশ্চিমের হাওয়াটা তার উপরে পুরো এসে লাগে, দেশগড়ার কাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কিভাবে কাজে লাগবে- সে বিষয়ে জাপান যে নীতি ও দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করেছিল তার এমন সঠিক উপলব্ধি ও চিত্রাঙ্কন সত্যিই নজীরবিহীন। তৃতীয় বিশ্বের বহু লোক আজও জাপান ভ্রমণ করছেন-জাহাজ নির্মাণ, ক্যামেরা, ইলেকট্রনিকস ইত্যাদি শিল্পে তাদের দক্ষতা দেখে স্তম্ভিত হচ্ছেন- দু-চারটে সৌখিন যন্ত্রপাতি সংগে করেও নিয়ে আসছেন-কিন্তু, এ্যাডাপ্টিভ টেকনোলজী বা খাপ-খাওয়ানো প্রযুক্তি যে কিভাবে দেশগড়ার মন্ত্র হিসাবে কাজ করছে, সে সম্পর্কে তাদের অনেকেরই ধারণা ততটা পরিষ্কার নয়। শুধু ভ্রমণ নয়-মনের জানালা-দরজাগুলো খুলে রেখে বিজ্ঞানের আলো-বাতাসকে ঢুকতে দেওয়ার যে মানসিকতা, তা থাকা চাই। আর এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সাথে সমসাময়িক অন্য মনীষীদের পার্থক্য।

শুধু জাপান নয়, রাশিয়াতে গিয়েও তিনি বিজ্ঞানের আয়োজনটা বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন[৬] যে শুধু শ্বেত রাশিয়ার জন্য নয়-'মধ্য এশিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মত বেগে শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে- সায়েন্সের শেষ ফসল পর্য্যন্ত যাতে তারা পায় এই জন্যে প্রয়াসের অন্ত নেই'। রবীন্দ্রনাথ যে শেষ ফসলের কথা বলে গিয়েছেন তা এখনও বোনা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলোতে, তবে এক চরম উত্তেজনা আর প্রতিযোগিতার সাথে।

ইউরোপে গিয়ে ঐ মহাদেশটা কিভাবে বিজ্ঞানের স্পর্শ দ্বারা সর্বদেশ ও সর্বকালকে স্পর্শ করেছে তা রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে উপলব্ধি করে লিখেছিলেন[৭] 'বিজ্ঞান যে বিশুদ্ধ তপস্যার প্রবর্তন করেছে- সে সকল দেশের, সকল কালের, সকল মানুষের।' সার্বজনীন কবি রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের সার্বজনীনতাকে তুলে ধরবার যে প্রয়াস পেয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তবে কবি যদিও বলেছেন যে মানুষের অমরাবতী নির্মাণের বিশ্বকর্মা এই বিজ্ঞান, তবু তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এই ভেবে যে বিজ্ঞান মানুষের ফলকামনাকে অতিকায় করে তুললে যে হয়ে দাঁড়াবে যমের বাহন। তাঁর মতে 'এই পৃথিবীতে মানুষ যদি একেবারে মরে তবে সে এই জন্যেই মরবে- সে সত্যকে জেনেছিল কিন্তু সত্যের ব্যবহার জানেনি। সে দেবতার শক্তি পেয়েছিল-দেবত্ব পায়নি।' শান্তির লক্ষ্যে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করবার যে উদাত্ত

আহ্বান তিনি সেদিন জানিয়েছিলেন, তা আজও বিজ্ঞানী–অবিজ্ঞানী সবার কাছে উৎসাহ আর উদ্দীপনার সঞ্চার করবে, সন্দেহ নেই।

ইউরোপের ঔপনিবেশিকতা ও বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভংগী কবিকে ব্যথিত করেছে। তিনি বুঝেছিলেন যে, 'ইউরোপ আপন বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের মধ্যে আসেনি–এসেছে আপন কামনা নিয়ে।' তবে এজন্য রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কখনও দায়ী করেন নি। এ ব্যাপারে তার বিশ্লেষণ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। তিনি বলেছেন, 'যন্ত্রকে থামিয়ে দিয়ে কোন লাভ হবে না– থামাতে হবে লোভ'। আর শুধু ধর্ম উপদেশ দিলে চলবে না–তার সংগে বিজ্ঞানের যোগ চাই।' তার মতে, 'যে সাধনায় লোভকে ভিতরের দিক দিয়ে দমন করে সে সাধনা ধর্মের কিন্তু যে সাধনায় লোভের কারণকে বাইরের দিক থেকে দূর করে সে সাধনা বিজ্ঞানের। দুইয়ের সম্মিলনে সাধনা সিদ্ধ হয়, বিজ্ঞান বুদ্ধির সংগে ধর্ম বুদ্ধি আজ মিলনের অপেক্ষায় আছে।' রবীন্দ্রনাথ যে মিলনের বাণী শুনিয়েছিলেন, তা আজও মানুষকে আশা দেয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় বসবাসকারী পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ আজও পাশ্চাত্যের এই শুভ বুদ্ধির অপেক্ষায় আছে–কবে তার উদয় হবে কে জানে।

শুধু বিজ্ঞান নয়– বিজ্ঞানীর প্রতিও ছিল রবীন্দ্রনাথের ভিন্নতর দৃষ্টি এবং তা ছিল কখনও স্নেহ কখনও ভক্তি আর কখনও শ্রদ্ধায় ভরা। এর দৃষ্টান্ত যে শুধু তার ব্যক্তিগত জীবনেই দেখা যেত, তাই নয়। তার সাহিত্যে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যেও তার প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে তার 'ল্যাবরেটরি' নামক গল্পে[৮] দেখা যায় যে সোহিনী মল্লিক নামক প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা সদ্য ডক্টরেট অব সায়েন্স ডিগ্রীধারী যুবক রেবতী ভট্টাচার্যের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করছেন। যুবকের পা ছোয়ার ছল হিসাবে তিনি বলছেন 'কিছু মনে করোনা বাবা, তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে আমি ছত্রির মেয়ে' ···· এ যুগে তোমার মত ব্রাহ্মণ ত আর খুঁজে পাবনা।' রেবতী অবাক হয়ে বলেন, 'আমার মত ব্রাহ্মণ'। এখন সোহিনীর জবাব হল– 'আমার গুরু বলেছেন এখনকার কালের সব–সেরা যে বিদ্যা তাতেই যার দখল, তিনিই সেরা ব্রাহ্মণ'। এখানে অবশ্য সেরা ব্রাহ্মণ বলতে সেরা বিজ্ঞানীকেই বোঝান হয়েছে। রেবতীর হাতেই সোহিনী তার স্বামীর ল্যাবরেটরী তুলে দিতে চেয়েছিলেন। গল্পে বোঝা যায় সোহিনী কিছুটা ছলনাময়ী কিন্তু এই নারীর মুখেও রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানীকে ব্রাহ্মণ হিসাবে চিহ্নিত করে হিন্দু মতাদর্শ অনুযায়ী তাকে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেছেন। বিজ্ঞানীর প্রতি এর চেয়ে বড় শ্রদ্ধা প্রদর্শন আর কি হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ শুধু যে বিজ্ঞানের গতি, প্রকৃতি ও এর অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধেই চিন্তা-ভাবনা করতেন তা নয়। তিনি বিজ্ঞান জগতের নানা খবর নিজে জানবার চেষ্টা করেছেন– নিজে জেনে আবার অন্যদের জন্য সেটা লিখেও গেছেন। 'বিশ্বপরিচয়' রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানপ্রীতি ও বিজ্ঞান–চর্চার একটা বড় স্বাক্ষর। পরমাণু–লোক থেকে শুরু করে নক্ষত্র–লোক, সৌরজগৎ, গ্রহলোক, ভূলোক প্রভৃতি প্রতিটি জগতের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও সেগুলোর বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন এই বইটিতে। অনেকদিন আগে লেখা বলে কিছু কিছু তথ্যকে সময়ের আলোকে একটু ঝালিয়ে নিতে হতে পারে মাত্র কিন্তু লেখার মূল সুর অর্থাৎ বিশ্বের বিভিন্ন লোকে পদার্থের সংগঠনের যে বিভিন্ন রীতি–নীতি, তা মূলতঃ অপরিবর্তিত থাকবে। বিশ্বপরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ ভাষার দিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন। সুন্দর সাবলীল ভাষায় বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বগুলোকে বোধগম্য করবার কি সহজ সাধ্য প্রয়াসই না বিশ্বপরিচয়। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে পরিভাষায় প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তবে রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায় 'পরিভাষা হচ্ছে চব্যজাতের জিনিস। দাঁত ওঠার পরে সেটা পথ্য'। সেই কথা মনে রেখে রবীন্দ্রনাথ যতদূর সম্ভব পরিভাষা এড়িয়ে সহজ ভাষার দিকেই মন দিয়েছেন। আজও বাংলাভাষায় বিজ্ঞান–চর্চার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত পথনির্দেশক হিসাবে কাজ করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান–মানসের কথা বলতেই সকলের মনে বিশ্বপরিচয়ের[৯] কথাই আগে জাগতে পারে। এই বইটিতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তার জ্ঞান ও চিন্তাভাবনার মূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। তবে তা রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানমানস–এর সামান্য অংশের 'পরেই আলোকপাত করে মাত্র। বড় অংশটাই প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে আছে তার কবিতায়, গানে, গল্পে, নাটকে, উপন্যাসে। এই সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানা উপকরণ কুড়িয়ে এনে তা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান–মানসকে সঠিক ছাঁচে ফেলা খুবই কঠিন কাজ সন্দেহ নাই। তবে এতে রয়েছে অনাবিল আনন্দের অবকাশ।

রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবনেও বিজ্ঞানকে মাটির কাছাকাছির জিনিস হিসাবেই স্থান দেবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। নিজের ছেলেকে তিনি কাব্যচর্চা নয়, কৃষি–চর্চাতেই উৎসাহিত করেছিলেন। তাছাড়া শান্তিনিকেতনে যে সব প্রজেক্টের মারফৎ তিনি পল্লীমঙ্গলের কথা ভাবতেন, তা দেশজ প্রযুক্তির প্রতিই তার গভীর আস্থা ব্যক্ত করে।

রবীন্দ্রনাথকে সবাই জানে সার্বজনীন কবি হিসাবে, গীতিকবি হিসাবে, আধ্যাত্মিক কবি হিসাবে–কিন্তু সে কবি শুধু যে প্রকৃতি–পাঠের মাঝে

বিজ্ঞানের বৈচিত্র্য আর রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন তাই নয়– এই আপনভোলা প্রকৃতি–পাগল কবি পৃথিবীর সর্বত্রই জীবনের বিকাশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে নিয়োজিত হতে দেখেছেন–দরিদ্র দেশগুলোতেও বিজ্ঞানের আয়োজন কামনা করেছেন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে।

এ মুক্তি আজও আসেনি। আজও কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী সবাই এই অর্থনৈতিক মুক্তি চাচ্ছেন। তবে মুক্তি অর্জনের পথে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি– এ কথা শুধু বিজ্ঞানীরাই বুঝবেন তা নয়–বুঝতে হবে সমাজের সবাইকে। অর্ধ শতাব্দীরও আগে রবীন্দ্রনাথ দেশগড়ার কাজে বিজ্ঞানের যে ভূমিকার কথা লিখেছিলেন–তা আজও বাস্তবায়নের অপেক্ষায় আছে। উন্নত ও উন্নয়নকামী দেশগুলোর মধ্যে আজ অর্থনৈতিক বৈষম্য যতটা বিরাট হতে বিরাটতর হতে চলেছে–অতীতে ততটা কখনও হয়নি। তবে এই বৈষম্য ঘটেছে যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগে, এ বৈষম্য দূরও হতে পারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগে। নয়া বিশ্ব–অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রণয়নে এ কথাটাই মনে রাখা দরকার। পরিশেষে বলা চলে যে, আজকের জীবন ও পরিবেশের চিত্রায়ণে রবীন্দ্রনাথের উত্তরসুরীরা যদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে তাদের আস্থার প্রতিফলন ঘটান, তা হলে সেটাই হবে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান–মানসের প্রতি সর্বোত্তম শ্রদ্ধাঞ্জলি।

তথ্যসঙ্কেত

১ *'বৃক্ষ বন্দনা'*, রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮, ২য় খন্ড, পৃ ৮৩৯

২ *'সভ্যতারপ্রতি'*, ঐ, ১ম খন্ড, পৃ ৫৫০

৩ *'শেষেরকবিতা'*, ঐ, ৯ম খন্ড, পৃ ৭৩৫

৪ *'জাপানযাত্রী'*, ঐ, ১০ম খন্ড, পৃ ৫০৭

৫ গ্রন্থপঞ্জী ৪, পৃ ৫২৩

৬ *রাশিয়ার চিঠি*, ঐ, ১০ম খন্ড, পৃ ৬৭৬

৭ *জাভা–যাত্রীর পত্র*, ঐ, ১০ম খন্ড, পৃ ৬০৭

৮ *'ল্যাবরেটরি'*, ঐ, ৭ম খন্ড, পৃ ৯৭৭

৯ *বিশ্বপরিচয়*, ঐ, চতুর্দশ খন্ড, পৃ ৮১৯